Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-IV, July 2020, Page No. 51-58
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্প: সমাজে টিকে থাকার লড়াই

ওয়াজিদা বেগম

Abstract:

Women lack voice, women are dominated- this age old thinking is not negotiable these days. We can very easily get to know this if we have a through look at the arena of Bengali literature. Through her writing Suchitra Bhattacharjee has achieved a true space in the world of Bengali literature. Consciousness about society and individualty plays as the key theme in Suchitra Bhattacharjee's short stories. There is a tendency in each character in her works to break away the barriers of societal norms and values. In about every character we find a continual search for apprehending a new life leaving behind their traditional and worn out life. Suchitra Bhattacharjee is keenly a realistic writer. A true picture of the social trials and tribulations is reflected in her writings through the strokes of her sharpened pen. An attempt has been made in this paper to depict the economic aspect of people's relationship among themselves and the criss cross and complexities of the relationship between man and woman.

Key words: Suchitra Bhattacharjee, Short Stories, Life, Women, Realistic

বাংলা সাহিত্যের জগতে ঊনিশ শতক থেকেই আমরা বাস্তবভাবনা ও কল্পনাবোধে অভিজ্ঞতাপূর্ণ বৈচিত্র্যময়ী নারীসত্ত্বা উপলব্ধি করি। কিন্তু তার পরিসর অত্যন্ত সীমিত। কারণ সাধ্য থাকলেও নারী তার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এই সাধ্য ও সাধের খোলস ভেদ করে উঠে আসা একজন প্রতিস্পর্ধী লেখক হলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। প্রায় তিন দশক ধরে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। চোখে দেখা, কানে শোনা নানান সমস্যাবলী, দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্কের ওঠাপড়া তাঁর লেখার উপজীব্য বিষয়। শব্দকে নিয়ে খেলতেন তিনি। অজস্র উপন্যাস- ছোটগল্প- কিশোর রচনাসম্ভার ছিল তাঁর লেখার উপজীব্য বিষয়। শব্দকে নিয়ে খেলতেন তিনি। অজস্র উপন্যাস-ছোটগল্প-কিশোর রচনাসম্ভার ছিল তাঁর লেখার ঝুলিতে। গল্প নির্মাণের সময় লেখিকার মনে হয়েছিল চারপাশের জীবন, মানবিক সম্পর্কের ঘটনা, টানাপোড়েন, মূল্যবোধের ভাঙন, নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্ক, জটিল মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি দিকগুলো নিয়ে কিছু বলা দরকার। তার এই মনে হওয়াতেই সত্তর দশকের প্রান্ত সীমায় তিনি যেন নিজের মধ্যে খুঁজে পেলেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া লেখকসত্ত্বাকে। ঘুরে দাঁড়ালেন নিজের দিকে, সমাজের দিকে। লেখার জগতে আত্মপ্রকাশ ঘটলো ছোটগল্পকার সুচিত্রা ভট্টাচার্যের।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্পগুলির মধ্যে আমরা বর্তমান সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়, মনুষ্যত্বের অবহেলা, মানবীয় সম্পর্ক প্রভৃতির প্রতিফলন দেখি। তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। এই শতাধিক গল্পের বিষয়বস্তু সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে, অঙ্কিত হয়েছে ছোটগল্পের চরিত্রগুলি।

'রেসিং হর্স' ছোটগল্পটি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ গল্প সমগ্রের একটি গল্প। গল্পটি দ্ব্যর্থক ভাষায় লেখা। গল্পটি রেসকোর্স মাঠকে কেন্দ্র করে। মানুষের জীবনের সঙ্গে রেসকোর্সের তুলনা করা হয়েছে এখানে। গল্পের নায়ক সিদ্ধার্থ। রেসকোর্সের প্রতিটি ইভেন্টের মত সিদ্ধার্থের জীবনরসের প্রতিটি পর্যায় দোদুল্যমান। তার জীবনের প্রতিটি স্বপ্নই যেন রেসকোর্সের জুয়ার মত। জীবনের প্রতিটি স্তরেই হ্যাপি চাইল্ড, গোল্ডেন ড্রিম, ব্রাইট ফিউচার, ট্রু রিয়ালিটির সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করেছে জীবনটা যেন কাটা ছেঁড়া পাতার অক্ষর। নিম্নবিত্ত সমাজের অলীক ধনী হবার বাসনা সিদ্ধার্থকেও কখন যেন যুক্তিতর্কের গণ্ডী অতিক্রম করে কঠিন বাস্তবতায় নামিয়ে দিয়েছে।

এই গল্পের প্লট হিসেবে রেসের মাঠে উত্তেজিত জনতার চিৎকার, হুড়োহুড়ির পাশাপাশি অতনু-সিদ্ধার্থের ছোটার দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। রেসিং হর্সের বাজিতে হেরে গণ্ডগোলের শিকার অতনু, সিদ্ধার্থ। তাদের পকেটটা প্রায় গড়ের মাঠের মত ফাঁকা। সিদ্ধার্থের ভাগ্য সবসময়ই তার সাথে প্রতারণা করে। তিন বার রেসে বাজী লড়ে ফটকা ইনকামের পরিবর্তে হেরে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। গল্পের কাহিনির দৃশ্যপটগুলি এগিয়েছে ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে। রেসের মাঠের গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে পালিয়ে আসা সিদ্ধার্থ অতনু ভিক্টোরিয়ার ঝলমলে আলোর দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ তার শৈশব স্মৃতি 'হ্যাপি চাইল্ড' রোমন্থন করে শৈশবের সুখস্মৃতিতে গরীর পরিবারের একমাত্র অবলম্বন ও আশার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে সিদ্ধার্থ। ভয়কে জয় করতে শেখা সিদ্ধার্থ কখন যেন অতীতের জীবন অভিজ্ঞতায় ডুবে যায়। মনে করতে পারে না হ্যাপি চাইল্ডহুডের দিদ্ধার্থ ছিল 'মায়ের কোল ঘেষা বিরাট সাতমহলা বাড়ির স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র'। আবার এই সিদ্ধার্থই এক পা দু'পা করে হ্যাপি চাইল্ডের স্বপ্নের গণ্ডী অতিক্রম করে গোল্ডেন ড্রিম এ পৌঁছে যায়। সেই গোল্ডেন ড্রিমে রাজকন্যার মতো আসে মানসী। হবু ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধার্থের জন্য মানসী বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করে। কিন্তু রেসকোর্সের হর্সের মতই সিদ্ধার্থের সাদামাটা জীবনে নেমে আসে পরাজয়ের গ্লানি। মেধাবী ছাত্র হয়েও পরিস্থিতির শিকার হয় সে। তিনবার ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি সে। বাবা-মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ক্রমশ ফিকে হয়ে যেতে থাকে। ট্রু রিয়ালিটির করাল দৃষ্টির কাছে ব্রাইট ফিউচার ক্রমশ লীন হয়ে যেতে থাকে। গল্পের প্রধান চরিত্র সিদ্ধার্থ বন্ধু অতনুর কাছে তার স্বপ্নে দেখা ব্রাইট ফিউচারের গল্প করে। ব্রাইট ফিউচার কিভাবে বাস্তবতার কাছে হেরে যায় তারও বাস্তর রূপ সে তুলে ধরে-

> " ফিনিসিং-এ ব্রাইট ফিউচার ল্যাং খেয়ে গেল।... ব্রাইট ফিউচার ইন এ ওয়াক।...
> ব্রাইট ফিউচারকে পাঁচ লেন্থে মেরে পোস্ট ছুঁয়ে দিল ট্রু রিয়ালিটি।"[১]

'রেসিং হর্স' শুধু পড়াশোনা বা মানসী কে হারানোর ব্যর্থ প্রেমের গল্পই নয়, ' রেসিং হর্স' হল বাস্তবের কঠিন প্রতিযোগিতার কথা। বাস্তবতার আরও নগ্নরূপ দেখা যায় চাকরী প্রার্থী সিদ্ধার্থের ভালো ইন্টারভিউয়ের পরও সিলেকটেড ক্যাণ্ডিডেটদের চাকরীর ঘটনায় ভেঙে পড়ার মধ্যে। রেসিং হর্সের বাজীধরতে আসা সিদ্ধার্থের মনে হয়েছে তার জীবনটাও সেদিনের রেসিং হর্সের ঘোড়াগুলির মত উত্থান-

পতনের সামিল। এই গল্পে কঠিনন বাস্তবতা, রাজনীতির শিকার হওয়া মানুষের প্রতিনিধি হয়ে আমরা সিদ্ধার্থকে দেখতে পাই।

'মানুষ যেমন' ছোট গল্পটির মধ্যে মানুষের প্রতিদিনের আশা আকাঙ্ক্ষার, বাস্তবতার হদিশ মেলে। এই গল্পটিতে আমরা প্রধান- অপ্রধান অনেকগুলি চরিত্র দেখতে পাই। জন্ম অন্ধ ছেলে শতদল ঠাকুরমার কাছে বড় হয়েছে। শতদলের পূর্বের নাম ছিল বারীন। শতদল জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার বাবা মারা যায়। মা নয়নতারা এক কাপড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে অন্ধ ছেলেকে ফেলে ঘর বেঁধেছে। শতদল অপেক্ষা করে তার মাকে ফিরে পারার। সে স্বপ্ন দেখে তার মা পাখি হয়ে ফুল হয়ে, আলো হয়ে ফুটে উঠেছে। অন্ধবালক শতদল অংশুপতি কুণ্ডুর দোকানের সামনে বৃদ্ধ পিপুল গাছের তলার বসে রেবতী বৈরাগীর শেখানো গান গায়। উদ্দাত্ত কণ্ঠের গানে অংশুপতির মত ঘোর বিষয়ী লোক ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়, পথিকও দাঁড়িয়ে পড়ে।

সারাদিন গান গেয়ে শতদল সন্ধ্যায় তার ঠাকুরমার সাথে ঘরে ফেরে। ঠাকুরমার দেওয়া পান্তাভাত থেকে সে ভাগ দেয় পতিতা রাজকুমারীকে যাকে সে সখী বলে ডাকে। ঘোর বিষয়ী অংশুপতি কুণ্ডুর আর একটি আকর্ষণের জায়গা হয় রাজকুমারী। অংশুপতির ভালো লাগে রেবতী বৈরাগীর বাঁধা গান যা শতদলের সুরেলা কণ্ঠে মূর্ত হয়ে ওঠে।

> "-বুকের গাঙে আসছে তুফান,
> ও মন নৌকা বাঁধবি চল্…"[২]

-এসব গানের কথা অংশুপতিকে কাজ ভুলিয়ে দেয়। কড়ায় গণ্ডায় হিসেবি মানুষ অংশুপতি। খদ্দেরের তেলের শিশির বাইরের তেলটুকু সে কাঁচিয়ে তেলের টিনে রাখে। কিন্তু এসব হিসেব করেনি সে রাজকুমারীর বেলায়। রাজকুমারী একজন গতযৌবনা পতিতা নারী। রাজকুমারী ওরফে কুসুমি ছিল দালাল পুরের পতিতালয়ের বাসিন্দা। দারোগা থেকে ব্যাপারী সকলেই ছিল তার খদ্দের। কিন্তু কেউ একজন এক অচেনা দুরারোগ্য ব্যাধি দিয়ে গেছে রাজকুমারীর শরীরে। তাই তার রূপ নষ্ট হয়েছে। খড়ি ওঠা শুষ্ক চামড়ার তোবড়ানো গালে সে রঙ মাখে ঠিকই কিন্তু ভ্রূ-র ধনুক আর আগের মত নাচে না, ভোলায় না পুরুষের। তবুও রাজকুমারীকে অংশুপতির ভালো লাগে। ভালোবাসে তার নাচকে। তাই সবাই যখন রাজকুমারীর সাজ নিয়ে তামশা করে অংশুপতি তখন তার মুখে রুটি জোগায়।

রেবতী বৈরাগী খোঁজ করে চলে সুন্দরের। সে শতদলকে তার বাধা গান শিখিয়ে দেয়। আর শতদলের মায়ের সম্পর্কে শতদলকে নানান স্বপ্ন দেখায়। ঘর বিরাগী রেবতী বৈরাগী সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে অন্ধ বালক শতদলের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে। যার জন্য শতদল সারাদিন অপেক্ষা করে।

নয়নতারা ওরফে শতদলের মা শতদলকে ফিরিয়ে নিতে আসে। বাঁধ সাধে অংশুপতি। মধ্যস্থতা হয় টাকার অঙ্কে। কিন্তু অন্ধ শতদল তার মায়ের এই আগমন স্বীকার করতে পারেনি। যেনে নিতে পারেনি তার মায়ের বাস্তব রূপকে। স্বপ্নের মা তার কাছে আসে গাঙচিল হয়ে, পদ্মফুল হয়ে। কিন্তু অবস্থাপন্ন বাড়ির সুডৌল শরীরের মাকে চিনতে চায়না শতদল। নয়নতারা তার পরিচয় শতদলের কাছে দেবার পর থেকে শতদল শয্যাশায়ী। বেধুম জ্বরে শতদল তার স্বপ্নের মাকে খোঁজ করে।

রাজকুমারী ন্যালাক্ষ্যাপা হলেও সে তার প্রথম ভালোবাসার মানুষটিকে খুঁজে ফেরে লম্বাটে গড়ন মুখ ও বড় বড় চোখের সেই ছেলেটিকে যার খোঁজে ভ্রান্ত ধারণায় সে রেলে কাটা পড়ে। মৃত রাজকুমারীকে

নিয়ে সবাই আলোচনা করে অংশুপতির দোকানে। বড় ফাঁকা লাগে অংশুপতির। টাকার নেশায় চুর হয়েও মাতাল অংশুপতির- হৃদয়ে অব্যক্ত এক চেতনার স্রোত বয়ে যায়। তাকে অলক্ষ্যে কে যেন ভাবায়-

> "এ পৃথিবীতে সবুর তো করছে সবাই। শতদল যদি করে তার মায়ের জন্য, অংশুপতি করে টাকার। শতদলের ঠাকুমা যদি পথ চেয়ে থাকে সুখের, তো রেবতী বৈরাগী দিন গুনছে সুন্দরের। অমন যে ন্যালাক্ষ্যাপা আধবুড়ি বেশ্যাটা, সে-ও দ্যাখ্যা জীবনভর খুঁজে বেড়াল সেই নাগরটাকে। অষ্ট, না বিষ্টু যার নাম। আসবে বলে কথা দিয়েও যে আর ফেরেনি কোনদিন। এভাবেই জীবনের জন্য প্রতীক্ষা ফুরোলে তবেই কি মৃত্যু আসে? নাকি মৃত্যুতেই শেষ হয় প্রতীক্ষা? কে জানে"।[৩]

অন্ধ শিশুপুত্রকে ফেলে নয়নতারা নতুন সুখের সন্ধানে গেলেও আজও সন্তানের টান সে অস্বীকার করতে পারেনি। তাই সুখ সমৃদ্ধিতে থাকার সময়েও সে তার প্রথম পুত্রকে ফিরিয়ে নিতে চায়। কিন্তু শতদলের ঠাকুরমার সুখের স্বপ্নকে সে ভাঙতে পারে না। অংশুপতির কাছে টাকা দিয়েও নিজের ছেলে ফেরত পায়নি। অংশুপতি শতদলকে ফেরত দেবার জন্য রেবতী বৈরাগীর মুখোমুখী হয়। রেবতী জানায় তার সাথে নয়নতারা বৌদির প্রায়ই দেখা হয়। তবুও সে শতদলকে নানান স্বপ্নের কথা শোনায়। কারণ স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকাই হল মানুষের সত্যিকারের বেঁচে থাকা। আর এই স্বপ্ন চলে গেলে শতদলের আর কিছুই থাকবে না। সে খোলা আকাশের নিচে নিকষকালো জলের ধারে বসে পড়ে। অন্ধকার কারো মুখ ভেসে ওঠে। সে বোঝে সেই মুখ রাজকুমারীর। অংশুপতির হৃদয় থেকে বাঁধভাঙা ঢেউ আসে। সে গান গায়। বৈরাগীর বাধা গান। 'মানুষ যেমন' গল্পটিতে নানান চরিত্রের মানুষের ধরন পৃথক। তাই তাদের কৃত আচরণও আলাদা।

'অবগাহন' ছোটগল্পটির প্রধান দুটি চরিত্র হল হেমলতা ও স্মৃতিকণা। দুজনেই স্বামী পরিত্যক্তা এবং বিধবা। অমাবস্যা পূর্ণিমা বা একাদশী সহ বিভিন্ন তিথিতে তারা দুজনেই গঙ্গাস্নানে যায়। ছোট পিতলের ঘটি, গামছা কাপড় নিয়ে যখন কাকভোরে তারা গঙ্গাস্নানে রওনা দেয়, তখন তাদের গলির শহরবাসী ঘুমে অচেতন। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় দুই বৃদ্ধাই চলেছে নিজেদেরকে ছোয়াছুয়ির হাত বাঁচিয়ে। হেমলতা ও স্মৃতিকণা দুজনেই গঙ্গাস্নানে যাবার সময় শহুরে গলির এ রকম দুরাবস্থায় অস্বস্তি প্রকাশ করলেন। তাদের অস্বস্তি শুধুমাত্র রাস্তার অসংলগ্নতাতেই নয়। তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় মণ্ডলদের বাড়ির পতিতা মেয়ের মুখদর্শনে। দুই বৃদ্ধা স্নানে চলেছেন মণ্ডলদের মেয়েটার নৈতিক ত্রুটির কথা বলতে বলতে। সে প্রসঙ্গে তাদের স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে নিজেদের ঘরকন্নার কথা। এরা দুজনেই এখন অপরের আশ্রিতা। অন্যের সংসারের বোঝামাত্র। মণ্ডলদের পতিতা মেয়েটির কথা প্রসঙ্গে যখন হেমলতা তাঁর শিক্ষাদীক্ষার কথা তোলে, স্মৃতিকণার চোখ তখন স্মৃতির ভারে ভিজে আসে। মনে পড়ে যায় ভাইদের সংসারে তার দুরাবস্থার কথা। শিক্ষিত ভাইপো বউয়েরা যখন তাকে নাস্তানাবুদ করে, অসহায় অশীতিপর এই বৃদ্ধার তখন নাজেহাল অবস্থা। তবুও সে টিকে আছে পোড়া গলিটার কোন এক সংসারে অবজ্ঞাও অবহেলার পাত্র হয়ে। তাই তার মনে হয়-

> "লেখাপড়া জানা মেয়েদের অবজ্ঞা আর অবহেলা সম্বল করেই তো তাঁর এখন বেঁচে থাকা। কোন যুবতী বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। এঘাট সেঘাট ঘুরে শেষ বেলায় এসে ঠেকেছেন ভাইপোদের সংসারে। আত্মীয় পরিজনদের হেঁসেল ঠেলে ঠেলেই এই জীবন কেটে গেল"।[৪]

হেমলতার গল্প একটু পৃথক। ছয়টি মৃত সন্তান প্রসবের পর তার কর্তা অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করেন। পরিত্যক্তা হয় হেমলতা। রাগ করে বাবার ঘরে আসলেও বাবা মারা যাবার পর পরই ভাইদের দরজায় ঝি গিরি করে মরে সে। তার এই দুরাবস্থায় হেমলতার বোনঝি ঝরনা তাকে নিয়ে যায়। ঝরনার বাচ্চাকে সামলায় সে। তাই ঝরনার মুখ ঝামটাও তাকে খেতে হয়। তবুও সে খুশি, পথে তো দাঁড়াতে হয়নি তাকে। দুই বৃদ্ধাই জীবনের শেষ বেলায় এসে তাদের জীবন অপরাহ্নের দুঃখগুলো ভোলার চেষ্টা করেন। টানা আটদিন বৃষ্টির পর একটু রোদের দেখা মিলতেই ঝরনার মেয়েকে কোলে করে হেমলতা স্মৃতিকণার সঙ্গে দেখা করতে আসে। স্মৃতিকণা ও হেমলতার মধ্যে আবারও মণ্ডলদের পতিতা মেয়েটিকে নিয়ে কথা হয়। তারা জানতে পারে গর্ভবতী মেয়েটির শরীরে খারাপ অসুখের কথা। মেয়েটিকে পতিতা হতে বাধ্য করেছে তার দাদা। এসব শুনে হেমলতা ফিরে আসে। রাতে স্বপ্নে দেখে-

> "পাঁকভর্তি একটা পুকুরে পড়ে হাঁসফাঁস করছেন তিনি। চারদিকে তার নিকষ অন্ধকার। পেটের ভিতর এক শিশু হাত পা ছুঁড়ছে। শিশুটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল।।... কে যেন বলে উঠল, -খাওয়া- পরা দিতে পয়সা লাগে না? হেমলতা ঠিক বুঝতে পারলেন না কথাটা কে বলল। একবার মনে হল দাদার গলা, একবার মনে হল বাবার।... হেমলতা ছটফট করে উঠলেন। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। পারছেন না।"[৫]

স্বপ্নে হেমলতা দেখে তার সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা। এই স্বপ্নটা তাকে আস্থির করে তলে। মেয়েদের অসহায়তার অর্থ বুঝতে পারে সে। তাই ভোর না হতেই মেয়েটাকে দেখতে চলে আসে। এসে দেখে স্মৃতিকণা মেয়েটির ঘরে বসে আছে। খারাপ অসুখ হওয়ার কারণে মেয়েটিকে কেউ ছোঁয় না, কাছে যায় না। তাই স্মৃতিকণা এসেছে মেয়েটির দেখভাল করতে। হেমলতাও তার জড়তা কাটিয়ে মেয়েটির মাথার কাছে বসে, মেয়েটির ঘায়ের গায়ে মলম লাগিয়ে দেয়।

সমাজ ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু রূপের পরিচায়ক হল 'অবগাহন' গল্পটি। পরপারের যাত্রী দুই অশীতিপর বৃদ্ধা মোক্ষলাভের আশায় গঙ্গাবক্ষে অবগাহনের সময় এতসব ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। তারা গঙ্গায় স্নান করে পাপমুক্ত হতে চায়লেও অতীত ও বর্তমান তাদের বাস্তবের করাল রূপটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তারা দুজনেই হঠাৎ সমাজ সংস্কারের বিধি নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করে মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। সমস্ত সংস্কার ঝেড়ে ফেলে ছোঁয়াছুঁয়ির তোয়াক্কা না করেই দুজনে সেই গর্ভবতী অসহায় মেয়েটির সেবা- যত্নে লিপ্ত হয়েছেন। যেকোন ভাবেই বাঁচাতে চেয়েছেন মেয়েটির গর্ভস্থ সন্তানকে। দুই বৃদ্ধাই আশ্রিতা হয়েও সামাজিক অনুশাসনের ভয়কে উপেক্ষা করে মেয়েটিকে আশ্বাস দিয়েছে-

> "হেমলতা যত্ন করে মলম লাগিয়ে দিচ্ছেন শরীরের ঘায়ে। স্মৃতিকণা মেয়েটির মাথায় বালিশ তুলে দিলেন ভালো করে।... দুই বুড়ি একসঙ্গে ঝুঁকে পরলেন,- শোন রে, তোর কোনও ভয় নেই। আমরা তোর কাছে আছি। তুই ঠিক ভালো হয়ে উঠবি।"[৬]

পতিতা মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মনে হয়েছে পূর্ণিমা বা অন্য কোন তিথির মতো আজও একটি বিশেষ দিন। তাই তারা দুজনেই মেয়েটির সেবাযত্নের পরে গঙ্গাবক্ষে অবগাহন করতে চেয়েছেন।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দাফন' গল্পটি এক ইসলাম ধর্মীয় আচার সংস্কৃতি প্রেক্ষাপটে রচিত। এই গল্পের প্রধান চরিত্র শাকিলা। শাকিলা হানিফের স্ত্রী। হানিফের অকাল মৃত্যুতে চার ছেলে মেয়ে নিয়ে শাকিলা অকুল

পাথারে পড়ে। হানিফের চার ভাই প্রত্যেকেই পৃথক সংসারে থাকে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, হানিফ মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তার জ্ঞানত অবস্থায় শাকিলা সঞ্চিত টাকা কোথায় রাখা আছে তা জানতে চেয়েছে। কিন্তু মৃত্যু পথগামী হানিফের অস্পষ্ট বক্তব্য কোন অর্থই দিতে পারেনি শাকিলাকে। পারিবারিক সম্পত্তির একটি অংশ হল এক ফালি পুকির- যে পুকুরটি হানিফ ও তার ভায়েরা এক এক বছর অনুসারে ভাগে পায় এক এক ভাই। পড়ে গিয়ে হানিফের হৃদরোগে মৃত্যু হয়। ডাক্তার আসার পরও হানিফের অবস্থার কোনরকম উন্নতি হয় না। অসহায় শাকিলা ভেঙে পড়ে। সন্তানদের কথা ভেবেই সে পুকুর চাষের কথা জানতে চায়। হানিফও শেষ চেষ্টা করে টাকার সন্ধান বলতে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়ে যায়। লেখিকার ভাষায়-

> "শাকিলা প্রাণপনে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল দুর্বল হাতটাকে। বাইরে কালো কাক ডেকে উঠল কা-আ-আ, কা-আ-আ-। শেষবারের মতো বুক থেকে কিছু শব্দ তুলে হানিফ একবারে চুপ মেরে গেল। বোবা চোখে শকিলা দেখল পাখিটা উড়ে যাচ্ছে।"[৭]

হানিফের মৃত্যুর পর কপর্দক শাকিলা অসহায় হয়ে পড়ে। হানিফের মৃতদেহের দাফন করানোর জন্যও কিছুমাত্র কানাকড়ি শাকিলার হাতে থাকে না। হানিফের আত্মীয় পরিজনেরা সবাই আসে। কিন্তু টাকার কথার সকলেই পিছিয়ে যায়। হানিফের ভাইরা সবাই পুকুর চাষের টাকা চায়। তারা সবাই বারংবার চেষ্টা করে হানিফের সঞ্চিত ধন পেতে কিন্তু কেউই মৃতদেহ সৎকারের জন্য ন্যূনতম প্রচেষ্টাও করে না। শাকিলার পোষা ছাগল দুটো বিক্রি করে দাফনের টাকা জোগার কররার চেষ্টা করে। কিন্তু শাকিলা কোন সঞ্চিত অর্থের সন্ধান পায় না।

শাকীলার ছেলে নুরুল গিয়ে মোল্লা সাহেবকে ডেকে আনে। কবর দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ফর্দ্দ করে দেয় মোল্লা। হানিফের দুই ভাই খালেক ও হাবিবুর রাজারে যায়। লতিফ ও নুরুল কবরের মাটি কাটতে থাকে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় সাধারণের ব্যবহৃত কবরস্থান টি বিক্রি হয়ে যাওয়ায়। এখানেও দাম মেটাতে হয় শাকিলাকে। দাফনের পর জনাকুড়ি বাইরের লোককে খাওয়ানোর দায়িত্ব এসে পড়ে তার কাঁধে। শাকিলার কোলের সন্তান সাইরা ও সিরাজুল উপবাসী কিন্তু হানিফের পরিজনেরা সকলেই টাকার কথা ভাবে। হানিফের দাফন পর্ব শেষ হলে রাতে শাকিলা তার সন্তানগণকে নিয়ে ঘরের মাঝে বসে থাকে। গভীর রাতে শাকিলা শব্দ পায় ধান ঝারার। দরজার আগল খুলে বাইরে বের হতেই কয়েকটি কালো হাতের থাবা তাকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। আলুথালু শাকিলা ঘরে ফিরে আসে। হানিফের দেখানো অব্যক্ত সংকেতের অনুসরণ করে কিশোর ছেলে নুরুল কে নিয়ে খুঁড়ে ফেলে ঘরের মেঝে। পায় সম্পদ। সে সন্তানদের বাঁচেয়ে রাখার জন্যই প্রাণপনে নিজেকে সামলায়। কান্নায় ভেঙে পড়ে হানিফের শূন্য তক্তপোষের দিকে চেয়ে।

আলোচ্য গল্পে মৃতদেহ দাফনকে কেন্দ্র করে শাকিলা পারিবারিক রাজনীতির শিকার হয়েছে। বলি হয়েছে সামাজিক অনুশাসনের কাছে। কিন্তু অসহায় শাকিলার কথা, পিতৃহীন ছেলেপুলেদের কথা কেউ ভাবেনি- না সমাজ না হানিফের পরিজন। সকলেই ভেবেছে হানিফের সম্পত্তি গ্রাসের কথা। সঁমাজের বাস্তব চিত্রের কঠিন রূপ ফুটে উঠেছে 'দাফন' গল্পে।

'ঝিনুক খোঁজার বেলায়' ছোটগল্পটিতে শহুরে জীবন থেকে পালিয়ে একাকী নিঃসঙ্গ মাধুরীর গল্প বর্ণিত হয়েছে। মাধুরী তার মেয়ে জামাই তুতুন আর নীলাঞ্জনের সঙ্গে পুরীতে বেড়াতে এসেছে। তুতুন-

নীলাঞ্জনের স্নানের একান্ত রঙিন মুহূর্ত মাধুরী তীরে বসে দেখছেন। এক সময় নিজেই লজ্জা পেয়ে সরে এসে তার এক পুরানো বন্ধু সুখময়ের সঙ্গে দেখা হয়। সুখময় তার স্ত্রীকে চেঞ্জে নিয়ে এসেছে। মাধুরী সুখময়ের স্ত্রীকে দেখার পর তার বৈধব্য নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা উপলব্ধি করে। মাধুরীর মনে পড়ে যায় দেবতোষের কথা। বিয়ের পর দেবতোষ ও মাধুরী দুজনেই এসেছিল পুরীতে। মাধুরীও তুতুনের মতই ভয় পেত জলে নামতে। নীলাঞ্জনের মতো দেবতোষ তাকে জোর করে জলে নামাতো। পাঁচ বছর আগে স্ট্রোক হয়ে দেবতোষ মারা যায়। সেই থেকেই নিঃসঙ্গ জীবন মাধুরীর। কলেজে পড়ার সময় মাধুরীর প্রতি অনুরক্ত ছিল সুখময়। কিন্তু মাধুরী ভালোবাসতো দেবতোষকে। দেবতোষ-মাধুরীর বিয়ে হলে সুখময় কলেজ ছেড়ে দেয়।

সুখময়ের সঙ্গে দেখা আর নীলাঞ্জন তুতুনের খুনসুটি মাধুরীর নিঃসঙ্গতা বাড়িয়ে দেয়। সে অনুভব করে দেবতোষের শূন্যতা। ভূলবশতই একসময় নীলাঞ্জনের তামাটে লোমশ হাত দেবতোষের হাত বলে ভুল করে সে। সবাই মিলে ঠিক করে সমুদ্রে নামবে। কিন্তু মাধুরীর সংযমের পরিচয় পাওয়া যায় এখানেই। তার গভীর জীবন বোধের উপলব্ধিতে সে দেবতোষকে অনুভব করতে চায়। পঁচিশ বছর আগের দেবতোষ-মাধুরীর রঙিন মুহূর্তকে বাঁচিয়ে সে সমুদ্রের তীরে তীরে ঝিনুক খুঁজে চলে। যে ঝিনুকের মধ্যে তার জীবনের সবচেয়ের দামী মুহূর্তগুলো মুক্তো হয়ে আছে। উদাসীন মাধুরীকে খুঁজে ফেরে তুতুন –নীলাঞ্জন। দেখে তার ঝিনুক খোঁজার বেলাকে। তুতুন- নীলাঞ্জনের জোরাজুরিতেও মাধুরী জলে নামে না উপরন্তু তার গভীর জীবনবোধকেই সে তার মেয়ে জামাইকে বুঝিয়ে বলে-

> "গাঢ় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বড় রহস্যময় হাসলেন মাধুরী, যারা সমুদ্রের তীরে স্নান করে তারা কখনোই ততটা গভীরে যায় না নীলাঞ্জন। তোমাদের দু-জনকেই আজ একটা কথা বলি শোনো। সমুদ্রের যত উচ্ছ্বাস তীরের কাছেই। ভেতরে যাও দেখবে কী গভীর আর শান্ত থাকে সমুদ্র। অথচ জল কিন্তু একই। যেখানে ঐ আকাশ এসে মিশেছে সাগরে সেখানে কী অদ্ভুত প্রশান্তি।"[৮]

মেয়ে জামায়ের সঙ্গে ভ্রমণে নিঃসঙ্গ মাধুরী হৃদয়ে অনুভব করেছে দেবতোষের অনুপস্থিতি। কলকাতার কাজের পরিবেশ যা কোনভাবেই সম্ভব নয়। পুরীর সমুদ্র সৈকত ও ঝিনুক খোঁজার অবসর তাকে দিয়েছে অতীতের সুখ স্মৃতিচারণের মুহূর্তের দৃশ্যপটকে সাজাতে।

'একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' গল্পটির মাধ্যমে সমাজের বাস্তব জীবনের অবক্ষয়িত রূপকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই গল্পে দেখা যায় শিয়ালদহ স্টেশন চত্তরে ঘর ভিখিরি পঙ্গু মানুষের জীবন যাত্রার কথা। রেলে কাটা দু'পাহীন গিরিধারী ধর্মতলার মোড় গান গেয়ে ভিক্ষা করে। তার পোষ্য ছেলে কুড়ানী তাকে সকালে দিয়ে আসে এবং সন্ধ্যায় নিয়ে আসে। হঠাৎ একটা পাগলির আগমন ঘটে। পাগলির চেহারাতে অর্ধনগ্ন অবস্থা, রাংতার মুকুট লাগানো। এই পাগলি এসে হঠাৎই গিরিধারীর শোবার স্থান দখল করে। গিরিধারী ও কুড়ানী দুজনেই পাগলিকে তাড়িয়ে দেয়। পাগলি গিয়ে টিকিট ঘরের পাশে বসে। অর্ধনগ্ন পাগলিকে সবাই দেখে। মুটে, মজুর, জি.আর.পি, মস্তান সকলেই পাগলিকে খাবার লোভ দেখিয়ে ঘরের দিকে নিয়ে যায়। পাগলি এখন এই খাবার দেখানোর অর্থ বোঝে এবং খাবার পাওয়ার পর কি করতে হয় জানে। অল্পদিনেই পাগলি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। বারবার পাগলি গর্ভবতী হয় এবং গর্ভপাতও ঘটে যায়। গিরিধারীর পাগলির ওপর এই অত্যাচার একদম ভালো লাগে না। সে পাগলিকে এইসব নরখাদকের হাত থেকে বাঁচাতে চায়। পাগলির কথা ভাবতে ভাবতে গিরিধারী অসুস্থ হয়ে পড়ে। গান ভুলে যায়। কুড়ানী তার

ধরম- বাপের উপর রেগে যায়। একদিন পঙ্গু গিরিধারী সন্দেশ ও রুটি নিয়ে গভীর রাতে পাগলির কাছে যায়। এক অজানা স্রোত খেলা করে গিরিধারীর শিরায় শিরায়। গিরিধারী পাগলিকে খাবার দেয়। পাশে বসিয়ে ভালোবাসার কথা বলে। আর বলে সারা জীবন খাবার দেবার কথা। কিন্তু পাগলি আবারও গর্ভবতী হয়, গর্ভপাতও ঘটে। গিরিধারী আবারও চায় নরখাদকের হাত থেকে পাগলিকে বাঁচাতে। এই জন্যই কুড়ানীকে পয়সা দিয়ে গভীর রাতে পাগলির সন্ধান করে। কুড়ানী বিরক্ত হয় কিন্তু টাকার লোভে সে পাগলির খোঁজ আনে প্রতিনিয়তই। সে দিন পাগলির খোঁজে বিরক্ত হলেও অসংলগ্ন অবস্থায় পাগলির দেহ ও মুখের মধ্যে ফুটে ওঠে কুড়ানীর মায়ের মুখ। সে পাগলিকে তার জামা দিয়ে ঢেকে দেয়। পাগলি কুড়ানীর হাতকে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে চেপে ধরে। কলকাতার বিবর্ণ ক্ষয়িত রূপের মধ্যে মানুষের বিকৃত জীবন যাত্রার সামগ্রিক রুপ ফুটে উঠেছে এই গল্প।

ছোটগল্পের বিষয়বস্তু সুচিত্রার সাহিত্য প্রতিভার সুতীক্ষ্ম লেখনীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুচিত্রার চরিত্ররা সব সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার ছাঁচে গড়া। তাঁর ছোটগল্পের কাহিনি বিন্যাস, বিষয়বস্তু, উপস্থাপন রীতি, ভাষার প্রয়োগ অত্যন্ত সুনিপুণ চরিত্ররা কাল্পনিক গড়া নয়, বাস্তবের নগ্নজালে সৃষ্ট।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য সুচিত্রা, গল্পসমগ্র-১, রেসিংহর্স, পৃ-৪৭।
২. ঐ, মানুষ যেমন, পৃ-৭০।
৩. ঐ, পৃ-৭৭।
৪. ঐ, অবগাহন, পৃ-৮২।
৫. ঐ, পৃ-৮৩।
৬. ঐ, পৃ-৮৪।
৭. ঐ, দাফন, পৃ-১০৫।
৮. ঐ, ঝিনুক খোঁজার বেলায়, পৃ-১২২-১২৩।